# এসো হে বৈশাখ

## এসো হে বৈশাখ

মো: আলী আজম

এসো হে বৈশাখ এসো হে-
বংশ বংশানুক্রমে যারা ভুমিষ্ট হয় না
যাদের জীবন-বেদে মাটি শুধুই কাদা
ওদের সুললিত আবাহনে এসো, এসো হে।

ফ্রিজবন্দী পান্তা, গরুর দামে কেনা ইলিশ
টকশো'র বাচাল আর কাগুজে বুদ্ধিজীবি
চারুকলার সঙ  বটতলার বিলাপে
 বৈশাখ- এসো, এসো হে।

ডিজিটাল প্রগতির পথে
মরা নদী খরার মাঠে কবন্ধ সভ্যতার উল্লাস
কর্পোরেট হালখাতার নবান্ন ডিনার ব্যাংকোয়েটে
জাত দিয়ে পাত পেতে এসো হে বৈশাখ এসো হে।

aliazamali@hotmail.com

## দিন বদলের ছড়া

প্রবীর বিকাশ সরকার
টোকিও, জাপান

দিন বদলের ডাকটি দিয়ে
ভোট কেড়েছে ভোট
আসল কাজের খবর নেই
ফাঁকা বুলির চোট।

ভেবেছিলাম লোকের ভাগ্য
বদল করবে জোট
বরং দেখি হচ্ছে বদল
কেবলই সাইনবোর্ড।

#

## বলাকা

**জালাল কবির, কানাডা**

রুপসী বধুর মত আভরণ পরে ;
দিন শেষে সন্ধ্যা যখন আসে
কার্তিকের ধানশীষ চুমিতে চুমিতে।
রাঙা রবি মিশে যায় নীলিমার নীলে ;
বনানীর আলোছায়া ঘিরে
বাতাসের লুকোচুরি খেলা
চলে কি না চলে ।
ধানড়্গেত ছেড়ে লাল শাপলা ফেলে
সাদা বলাকা তুমি যখন উড়ে যাও
দুর থেকে দুরে।
সৃষ্টির সমস্ত আবেগ যেন
ঢেলে দিয়ে যাও কবিতার রম্নপালী মাঠে।

তুমি যেন রাজদুত,
শান্তির বারতা লয়ে ধীর নম্র বেগে
ছুটেছো পুলক মনে, অসীমের পানে।
তোমার শুভ্র পালকের মত
অন্তর হোক মানুষের এই কামনায়
খুঁজিনু তোমায় হে বলাকা ;
ফিরে এসো আবার এই ধান ড়্গেত
এই লাল শাপলা শালুকের বিলে ;
যখন কুয়াশার ওড়না হিম হবে
ভোরের বাতাসে।

২.

# বাংলার নদী

আশ্বিন শেষে ওগো দুরন্ত নদী
ক্লান্ত পথিকের মত তরুচ্ছায়ে ধীরে ;
থেমে থেমে চলেছ কি তুমি
বাংলার ঘাসমোড়া সবুজ তীরে ?
হেথায় সরিষার গন্ধ মেখে
তীর তরঙ্গ চুমি চুমি ডানে আর বায়ে ;
কোথায় চলেছো তুমি
লাজুক বধুয়ার মত ধীর পায়ে ?
হয়তো এমন দিনে
সতী বেহুলাও লখিন্দরকে ভেলায় তুলে ;
কেঁদে কেঁদে দিয়েছিল বিদায় তোমার কূলে।
তেমনি হয়তো কত না রূপকথার
রাজকুমার আর রাজকুমারীর রাগ অনুরাগে
শত কাহিনীর নিরব সাক্ষী
রয়ে গেছ তুমি যুগ যুগ আগে।

যখন একাকী চল  চঞ্চল বায়ে ;
রাতের আধারে একফালি চাঁদ কিংবা
তারকার ঝিকিমিকি নিয়ে কাশবন হেলায়ে।
মনে হয়  দুরন্ত অভিসারি তুমি ;
তুমি প্রিয়তমা।
তুমি ছাড়া  এ জীবন রুদ্র রুগ্ন ;
খরতাপে ব্যাকুল করা।
হে নিরব নদী,
তুমি কি চিনিতে পার তাহারে ?
যে ছন্দময় নিতম্ব  দুলায়ে
ঘটি ভরে জল নিয়ে চলে যায় ঘরে ;
চরণের কোমল চিহ্ন রয়ে যায় আঁকা
দুপুরের ঝাঁঝ মাখা চরে।

Jalal.kobir@gmail.com

## মুক্তিসেনা ও শ্যামলীমা

### প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

মুক্তি চাইলে পদাঘাত এ কেমন হিংস্রতা, কথায় কথায় চলে গুলি
তারপরও তুমি বলো, এসো শান্তির প্রদীপ জ্বালি এক সাথে চলি, গড়ি স্বদেশ ওরা রক্ষক স্বাধীনতার
আমাদের নেতারা ও আমরা, অকাল বিধবা ললনার এলোচুলে রেখে হাত শুভ্রতার কথা বলি।
অসময়ের বলিরেখা তলে তার শ্যামল সুন্দর ললাট প্রকাÉ ধরিত্রীর মতো বিশাল
ওখানে সেঁটে দেবো লাল বর্ণটিপ সিঁথির সীমান্ত আবারো হবে দীপ্তিমান লাল-সবুজে বর্ণিল
শেষ নয়, অভিসম্পাৎ নয় শক্ত সবল হাতে চলো লাল-সবুজের পতাকা তুলি মুক্ত মঞ্জিলে
হে মুক্তিসেনা, নিভে যাবে পৃথিবীর হলুদ আগুন সোনালী ফসলে রক্তময় মাঠ হবে শ্যামল
ধীরে ধীরে থেমে যাবে যুদ্ধ আবারও সৃষ্টিমুখর হবে জাতি, শোনা যাবে শিশুর কোলাহল
থেমে যাবে শোকের মাতম, ভয়হীন চিত্তে নাচবে শালিখ-দোয়েল পাখি-পায়রার দল
টিলার ঢালে, চা বাগানের শীর্ণ চারা ঘিরে আবারও কৃষ্ণকায় দু'টি হাত হবে সচল।
হে মুক্তিসেনা! স্বাধীন স্বদেশে খুলে দাও তোমার প্রেমের অর্গল, হাতে তোল সুরের বীণ
যদিও ঘাতক দাঁড়িয়ে আছে হাতে হাতিয়ার, নির্ভয়ে থাকো তুমি সূর্য আকাশে দীপ্তমান
নিপতিত প্রজা, নুয়ে পড়া দেহে শ্রমের ধকল, প্রতারিত সে তবুও প্রতিজ্ঞা হিমালয় সম
যদিও তৈরি ঘাতক তবুও রক্তাক্ত বাংলা আবারও হাসবে, ভয় নাই রয়েছে ভালোবাসা সাগরসম।

## ২.
## অসহায় মুক্তিসেনা

### প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

ষোল ডিসেম্বর, দু'হাজার পাঁচ চারদিকে ব্যাপক আয়োজন, ব্যস্ত প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মীদল
হাতিয়ারহীন অসহায় মুক্তিযোদ্ধা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গীকারে দুর্বৃত্তের দুঃসহ আস্ফালন, ওরা দেশরক্ষক দল
এখনই ভেসে আসবে ঘোষণা, দরাজ কণ্ঠ ঘোষকের দারুণ আহ্বান সবাই সতর্ক হোন
অমুক নেতা, তমুক নেতার পদদলন, অঙ্গীকারে মাল্যদান, রাত গভীর হলে সুরায় আত্মসমর্পণ
আবারো গুলির শব্দে সচকিত স্মৃতির পাঁজর, ঝাপসা চোখে স্পষ্ট হয় যৌবনের রক্তঝরা একাত্তর
না, গুলি নয় তোপধ্বনি-পটকাবাজি আয়োজকদের একুশবার এ আমার অহঙ্কার, বলে রাজাকার
এফোঁড়-ওফোঁড় স্বপ্ন তার ডুকরে কাঁদে মুক্তিযোদ্ধা, সাবাশ অঙ্গীকার তোমার চত্বরে সোচ্চার আলবদর
কোথায় কমান্ডারের বাঁশি? ফুঁসে ওঠে একাত্তর, বারুদের বিশ্বাস, রাইফেল, স্টেনগান কেন নিরুত্তর?
সত্তরের মিছিলের মাস, একাত্তরের রক্তক্ষরণ, আজ কেন তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রশ্ন অসহায় মুক্তিসেনার?
ফিরে আসে গেরিলার গভীর গর্জন, মনে পড়ে চারদিকে বিজয়ের উলাস শত্রু সেনা হনন
শত্রু হননের অঙ্গীকার, সামনে অসংখ্য লাশ বন্ধী শত্রুসেনা আজ ম্রিয়মান অজেয় মুক্তিসেনা
চোখে-মুখে ষড়যন্ত্র ছিলো ঘাতকের, পালিয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়ে মাঠে-ঘাটে সবখানে
আজ তারা সম্মুখে, নেই রাইফেল, নেই কামান, উদ্যত সঙ্গীন, গুলিও ফোটেনা আর তাই অসহায় মুক্তিসেনা

## দিনলিপি-১
## সেলিম রেজা

অভিমান- অভিমান করে
নিঃশব্দ নিরিবিলি;
গোটা মাস কেটে গেল
কেউ ঠাহর করেনি।
দুঃখ- দুঃখ পেয়ে
পাশ ফিরে শোয়
গোটা বছর কেটে গেল
সুখ ঘরে ফেরেনি।
ভুল-ভুল করে
মানে না শাসন
গোটা যুগ কেটে গেল
শুনেনি বারণ।

২.

## অদৃশ্য কায়াগুলো রেখে যায় ভয়!
## সেলিম রেজা

গভীর রাত ভুতুড়ে অন্ধকার
শূণ্য বিরান, আলো আঁধারীর
ঠিক মাঝামাঝি তিনটি কায়া-
হেঁটে চলে নির্জনতার মহাশূণ্যে;
হাঁটে নিঃশব্দে কালো ছায়ায়
চেতন-অবচেতনে পথের ঠিকানা
বিপন্ন দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ
ভীত শঙ্কিত অস্থির সময়;
আচমকা যেন কালো মেঘের পাহাড়
ছেয়ে যায় চারিদিক
মুহূর্তেই অদৃশ্য তিনটি কায়া
শুধু রেখে যায় ভয়! ভয়!! ভয়!!!

৩.

## মাটির পুতুল
## সেলিম রেজা

নদীর ঢেউয়ে ভাসমান খেয়া
সময় পেরিয়ে যায় সময়ের নিয়মে
কিছু কিছু মানুষ এখনো
মুখোশ পরে গাঢ় অন্ধকারে;

স্মৃতির ক্যানভাসে জলছবি
কল্পনায় মাটির পুতুল
পুতুলটি কাঁদলো, অঝোর কান্না
হয়ত বা কেউ একজন
বয়ঃসন্ধি থেকে দুরন্ত জোয়ারের কাল
কাটিয়েছে পুতুলের পাশে শুয়ে...
গোপনে চলতো মান-অভিমান
সময় আড়মোড় ভাঙ্গে
কল্পনা থামে স্টপেজে....
ইশ্ পুতুল না হয়ে মানুষ হলে !

# কানাডা থেকে যুথিকা বড়ুয়া লিখেছেন বৈশাখের গল্প

## অন্নপূর্ণা

### যুথিকা বড়ুয়া

পাখীর কলোরবে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল পামেলার। পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরে উষার প্রথম সূর্য্যের কোমল রক্তিমাভা জানালার পর্দা ভেদ করে আবিরের মতো লাল হয়ে গিয়েছে সারা ঘর। ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু শীতল বাতাস আমোদিত হয়ে আছে, রং-বেরং-এর ফুলের মধুর সৌরভে। কি আনন্দময় হাস্যোৎজ্জ্বল সকাল! যেন সমস্ত মানুষগুলিকে অভিবাদন জানাচ্ছে আর অকুণ্ঠভাবে আহ্বান করছে, প্রকৃতির মন মাতানো বৈচিত্র্যময় রূপ আস্বাদন করার জন্য। চারিধারে হৃদয় আকুল করা কি মধুর আবেশ! ছুঁয়ে যায় মন-প্রাণ, সারাশরীর। ভরে ওঠে পরিতৃপ্তিতে।

চোখ মেলতেই চারিদিকে প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সমাহার এবং প্রাণবন্ত উচ্ছাসের টানে মুহূর্তে আড়মোড়া ভেঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠল পামেলা। ঢং ঢং করে ঘড়ির ঘন্টায় জানিয়ে দিলো, সকাল ছ'টা বাজে। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ পঞ্চমী। দেবীর বোধনের দিন। আজ সন্ধ্যায় বান্ধবী ঈশিতা, লাবণী, সুলোচনা ওরা সবাই বুড়ো শিবতলার পূজামন্ডবে আসবে দেবীর বোধন দেখতে। ঈশিতার মামাতো ভাই নিখিলদাও আসবে। সে খুউবই রসিক মানুষ। রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে বেশ। কথায় কথায় হাসায়। দারুণ মজা হবে।
ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্ময় হয়ে কাল্পনায় ডুবে গিয়েছিল, খেয়ালই ছিলনা। হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকে ওঠে। অবিলম্বে রিসিভারটা দ্রুত তুলতে যেতেই পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে ফিস্‌ফিস্ শব্দ।
খক্‌টা লাগল পামেলার। আশ্চর্য্য, সাত-সকালেই এতো জরুরী তলব মায়ের! ফোনটা এলো কোত্থেকে! আর করলোই বা কে! উৎকণ্ঠায় রিসিভারটা তৎক্ষণাৎ তুলে নিঃশব্দে আড়ি পেতে শুনলো। আর শোনামাত্রই বুকটা কেঁপে উঠল। বিনর্ণ হয়ে গেল মুখখানা। ভাটা পড়ে গেল আনন্দ-উলাসে। থেমে গেল ওর প্রাণবন্ত উচ্ছাস। মুহূর্তে বিষন্নতায় ছেয়ে গেল মন-প্রাণ সারাশরীর। কে এই ভদ্রলোক? সে কার মুখ দেখতে চায় না? কে তার সর্বণাশ করেছে? কে সে? আর মায়ের সঙ্গেই বা তার কি সম্পর্ক?

হাজার প্রশ্নের ভীড় জমে ওঠে পামেলার। ওকে প্রচন্ড ভাবিয়ে তোলে। কেমন রহস্যজনক মনে হয়। কিছু একটা যে ঘটেছে, তা অনুমান করেই অজানা বিভীষিকায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে দ্রুত ছুটে আসে মায়ের ঘরে। ওর চোখেমুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। কিছু বলার ব্যকুলতায় ঠোঁটদু'টো কাঁপছে।
ইতিপূর্বে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল রমলা। হঠাৎ পামেলার আগমনে হকচকিয়ে গিয়েছিল। রিসিভারটা তক্ষুণি ধপ্ করে রেখে কেটে দিলো লাইনটা। একটা ঢোক গিলে ফ্যাস্‌ফ্যাস্ শব্দে বলল,-'কিরে, উঠে এলি! কতবার বলেছি, রাতে শোবার আগে ফোনটা অফ্ করে রাখিস, ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তো, যা যা, গিয়ে শুয়ে পড়গে যা, আর কিছুক্ষণ গড়িয়ে নে!' এমন স্বাভাবিক গলায় বলল, যেন কিছুই ঘটেনি!

পামেলা নিঃশ্চুপ, নিরুত্তর। মায়ের অভাবনীয় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে থাকে। ওর চোখে অপার বিস্ময়, মনে সংকট, সংশয়। সৃষ্টি হয় প্রচন্ড মানসিক চাপ। অস্বস্তিবোধ করে। চোখমুখের অদ্ভুদ অবয়বে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক লাগছে ওকে দেখতে। ভারাক্রান্ত মন। চোখমুখ ঘেঁমে চুপসে গেছে। কিন্তু মুখে কিছু না বললেও অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের সাথে মায়ের কথোপকথনের বিষয়-বস্তুটি অবগতর জন্যই ওযে উৎসুক্য হয়ে আছে, তা বোধগম্য হতেই উপেক্ষা করে রমলা বলল,-"ওমা, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি! গিয়ে শুয়ে পড়, যা!"
বলে এক মুহূর্ত্যও আর দাঁড়ায় না। আঁচলে মুখ গুঁজে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পামেলা নাছোড়বান্দা। মায়ের পিছু পিছু চলে আসে ঠাকুরঘরে। টের পেলো না রমলা। হঠাৎ পিছন ফিরতেই চমকে ওঠে। পড়ে যায় বিপাকে। এখন কি জবাব দেবে সে। মুখ খুললেও বিপদ, না খুললেও বিপদ। উভয় সংকট। বিড়বিড় করে বলল,-"হে করুণাময়ী, দুর্গতিনাশিনী, এ আমায় কোন্ পরীক্ষায় ফেললে মা, মাগো! আমায় শক্তি দাও মা!"
বলে ধপাস করে বসে পড়ল ঠাকুরঘরের চৌকাঠে। চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। চকিতে তন্ময় হয়ে ডুবে যায় কল্পনায়। তারপর ধীরে ধীরে জলছবির মতো মনঃশ্চোক্ষে ভেসে উঠতে লাগল, ঘোর অমাবস্যার সেই গভীর নিশুতিরাত।

প্রলয়ঙ্করী বেগে ভয়াবহ তুফানি পবন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। মেঘের গুড়ুম গুড়ুম বিশাল গর্জন। সেই সঙ্গে মরা কাঁন্নার মতো বাতাসের একটানা গোঙ্গানী। রাজ্যের ধুলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। তন্মধ্যেই শুরু হয়, মুসলধারে বৃষ্টি। যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি। যেদিন প্রসবকালীন জটিলতার প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাত শিশুকন্যার জন্মলগ্নে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে নীরবে চলে গেল পামেলার গর্ভধারিনী মা সাবিত্রী। যেকথা আজও ওর অজানা! কিন্তু সেদিন কি ভাবতে পেরেছিল কেউ, যন্ত্রদানব এতো অসময়েই সাবিত্রীর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবে! স্বামী-সন্তান আত্মীয়-পরিজন সকলকে ছেড়ে সাবিত্রী এতো শীঘ্রই চির নিদ্রায় শায়ীত হবে! কি হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! একদিকে যমে মানুষে টানাটানি। অন্যদিকে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাত শিশু কন্যার একটানা বিরক্তিকর কাঁন্না।

একেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণতি! যেন হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় চোখের নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল, যোশ্বেরের সুখী সংসার ও আনন্দোৎচ্ছল জীবননদীর প্রবাহ। ডুবে গেল তার সংসার নামক তড়ীখানা মাঝ দরিয়ায়। যেদিন নিয়তির নিমর্মতায় জীবনের সবচে' আনন্দঘন মুহূর্তে প্রিয়তমা পত্নী বিয়োগের শোকে-দুঃখে বিহ্বলে মুহ্যমান যোগেশ্বরের সুন্দর সাজানো নিয়ন্ত্রিত জীবনকে অনিয়ন্ত্রিত করে তুলেছিল। বিরহ-কাতরতায় তাকে নিঃসঙ্গা করে দিয়েছিল। উন্মাদ করে দিয়েছিল। তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুখী সংসার ও আনন্দময় জীবনকে অর্থহীণ করে তুলেছিল। জীবনের প্রতি, সংসারের প্রতি কোনো স্পৃহাই আর ছিলনা। ক্রমান্বয়ে স্ত্রী হারানোর দহন যন্ত্রণায় তারুণ্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে বেছে নিয়েছিল, নির্বাসিত জীবন। যেদিন মানসিক শূন্যতাবোধে মনোবল, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-আশা-ভালোবাসা সব বিরহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

যোগেশ্বরের ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তানই বয়ে এনেছিল, তার সংসারের অমঙ্গল বার্তা। তার জীবনের একমাত্র সর্বণাশের কারণ। সে অলক্ষনী, সর্বনাশিনী। সর্বোপরি অসহিষ্ণুতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় যে অনাগত ভবিষ্যৎবাণী প্রিয়তমা স্ত্রী সাবিত্রীর জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল, যোগেশ্বর তা দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখে, তার মনের মণিকোটায়। যা আজও একান্তে নির্জনে নিরবিচ্ছিন্ন একাকী সন্ধ্যায় বারবার আঘাত করে, পীড়ি দেয় তার মুমূর্ষ্য হৃদয়কে। পারেনি, তা হৃদয় থেকে অপসারিত করতে। পারেনি স্ত্রী হারানোর শোক, দুঃখ বেদনা সব ভুলে গিয়ে পামেলাকে গ্রহণ করতে। ওর মুখদর্শণ করতে। আর করেনি বলেই আপন সন্তানকে পিতৃস্নেহ-আদর-ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনে আজও বাঁধতে পারেনি। পারে নি, হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো নিজ সন্তানের কোনো অবয়বই তার স্মৃতির গ্রন্থিতে ধরে রাখতে। আর তাই নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো সংস্কারপ্রবণ যোগেশ্বর তার নবজাত শিশুকন্যাকে পিতার স্নেহস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে আজও। যার লালন-পালন ও ভরণ পোষণের সমস্ত দায় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার ছত্রছায়ায় আলগে রেখে রমলা আজ এতকাল যাবৎ মাতৃত্বের শূন্য হৃদয় আঙ্গিনা ভরে রাখে, ওর নয়নতারা পামেলার আহালাদে, আবদারে। ওর হাসি-কলোতানের মধুর গুঞ্জরণে।

শ্বশুড়কূলের অগাধ সম্পত্তি রমলার। অথচ ভোগ করার কেউ নেই। স্বামীর মৃত্যুকালে স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত মালিকানা রমলার নামেই উইল করে দিয়ে যায়। ওর অবর্তমানে পামেলা। যার লালন-পালনে মুছে গিয়েছিল, বন্ধা নারীর কলঙ্ক। পুরণ করেছিল, মা হওয়ার সাধ। যার রক্ষণাবেক্ষণে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে রমলা ভুলে গিয়েছিল, স্বামী হারানোর শোক, দুঃখ, বেদনা। ভুলে গিয়েছিল, অকাল বৈধব্যের অন্তর্নিহিত কঠিন যন্ত্রণা। গর্ভে ধারণ না করলেও, সন্তান ও মায়ের (নাড়ীর) চিরন্তন একাত্ম বন্ধন না থাকলেও, আদর-স্নেহ-মমতা ও হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসায় দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। আত্মার সম্পর্ক। যার কখনোই ছিন্ন হবার নয়। আজ কেমন করে ওর জনমদাতা পিতার পরিচয় দেবে রমলা? কেমন করে বলবে, ওর পিতা আজও জীবিত!

বস্তুত একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, রমলা ওর গর্ভধারিনী মা নয়। যেকথা পামেলার জনমদাতা পিতার শপথ বাক্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আজ এতগুলি বছর বুকের ভিতর পাথর চাপা দিয়ে চন্দ্র, সূর্য্যের মতো এতবড় একটা সত্য ঘটনাকে গোপন করে রেখেছিল, শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু আজ, আজতো কিছুই আর গোপন থাকবে না। ঠিক এই ভয়ই করেছিল রমলা, সত্য কখনোই চাপা থাকেনা। একদিন উদ্ঘাটন হবেই!

কিন্তু পামেলাকে কি জবাব দেবে! এখন ও' আর ছোট নেই। ভালো-মন্দ বোঝার যথেষ্ট ক্ষমতা হয়েছে। বয়সের তুলনায় তর তর করে ষোড়শীতেই পূর্ণযুবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়! বাপের মতোই একরোখা। বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমনীয় ওর জেদ। সহসা হার মানার পাত্রী নয়। মোটেই পিছু ছাড়েনা মায়ের! ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলে আসে পিছে পিছে। কিন্তু ওর মৌনতা, বিমূঢ়তা এবং বিষন্ন চোখের চাহনি লক্ষ্য করে

মুখ লুকাবার চেষ্টা করে রমলা। কিন্তু পালাবে কোথায়! এক্ষুণি বিস্ফোরণ যে একটা ঘটবে, তা টের পেয়ে কম্পিত হতে লাগল ওর বুক। অশ্রুকণায় চোখদু'টো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। পারল না অশ্রু সংবরণ করতে, পামেলার নজর এড়িয়ে যেতে। আঁচলটা টেনে চোখ মুছতেই দ্রুত মায়ের সন্নিকটে এগিয়ে আসে পামেলা। গলার স্বর নরম করে বলে, –"মা, তুমি কাঁদছো? কিন্তু কেন? ভদ্রলোকটি কে? কি চায় সে? তিনি কার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন?'

আঁচলে মুখে গুঁজে পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকে রমলা। মুখে ভাষা নেই। মনে জোর নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। অনুভব করে, পায়ের তলা থেকে মাটি যেন একটু একটু করে সড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ যা কিছু কল্পনায় বিচরণ করছিল, এখন তা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছে। নিজেকেই অপরাধী মনে হয় রমলার। ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কায় কুঁরে কুঁরে খেতে লাগল। জীবনের শেষ সম্বলটুকুও যদি হারাতে হয়! যদি কখনো 'মা' বলে না আর ডাকে! রমলা বাঁচবে কি নিয়ে! কাকে নিয়ে!

পামেলা নাছোড়বান্দা। অধীর আগ্রহে মায়ের মুখপানে চেয়ে ছিল। হঠাৎ ওর কম্পিত কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে রমলা। –"বলো মা বলো, আজ আর চুপ করে থেকো না! বলো ঐ ভদ্রলোকটি কে? কে হয় তোমার? সে কেন তোমায় এভাবে বিব্রোত করছেন? কি জানতে চায় সে?"

মুখ তুলে তাকায় রমলা। অসহায় ওর চোখের চাহনি। ওর ঠোঁট কাঁপে, বুক কাঁপে। থর্‌থর্‌ করে সারাশরীর কাঁপে। বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মতো টপটপ্‌ করে ঝড়ছে, দু'চোখের বাঁধভাঙ্গা প্রপাতরাশি। পামেলাকে আজ ও' কেমন করে বলবে, ক্ষণপূর্বে যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভেসে এসেছিল, সে আর অন্য কেউই নয়, ওরই জন্মদাতা পিতা যোগেশ্বর। অথচ একই শহরে বসবাসরত, চাকুরীরত, সুস্থ্য, শক্ত–সামর্থ এবং জীবিত। যার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই পামেলার।

ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোনের রিংটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠতেই কেঁপে উঠল দুজনে। দ্রুত রিসিভারটা তুলে পামেলা বলল, –'হ্যালো!'

ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই একই কণ্ঠস্বর।–"হ্যাঁরে রমা, লাইনটা কেটে গেল কেন হঠাৎ! ভালো আছিস তো তোরা! কি রে, কথা কস না ক্যান? রাগ করছস খুব, তাই না! কি করি বল, ক্যামনে বুঝাই তোরে! আমার যে বড় কষ্ট হয় রে! কোনো মতেই ভুলতে পারি না!'

তৎক্ষণাৎ এপাশ থেকে পামেলা বলল, –'আপনি কে বলছেন?'

–'সে কি রে, আমায় চিনতে পারলি নে, আমি যোগেশ্বর!'
শুনে থ্‌ হয়ে গেল পামেলা। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশ্চুপ হয়ে থাকে। মনে মনে বলল, যোগেশ্বর, এ আবার কে! লোকটা কোথাকার আমদানি! এই নাম তো আগে কখনো শুনিনি! চোখেও তো দ্যাখেনি কোনদিন! অথচ কথাবার্তায় খুউবই ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে মায়ের! কে এই লোকটা!

ঠিকই অনুমান করেছিল রমলা। এতক্ষণ শোনার জন্য উৎসুক্য হয়ে কানদু'টো সজাগ করে রেখেছিল। কিন্তু পামেলার চোখ মুখের ভাব–ভঙ্গি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ভাবল, নাঃ, ফোনটা তাহলে ওরই কোনো বান্ধবী হবে হয়তো! এই ভেবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পামেলা টের পেলো না। তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল বিস্ময়ের ঘোরে। কিছুক্ষণ থেকে বলল,–"আমি রমা নই, পলি! কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না! আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমার মায়ের কে হন আপনি?'

যোগেশ্বর নিরুত্তর। জীবনে আজ প্রথম আপন সন্তানের স্নেহস্পর্শী শ্রুতিমধুর কোমল কণ্ঠস্বরে বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বিদ্যুতের শখের মতো একটা ঝটকা লাগল সারাশরীরে। আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। হৃদস্পন্দনও আরো দ্রুতগতীতে চলতে লাগল। রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। একটা শব্দও আর উচ্চারিত হয় না। রিসিভারটা ঝট্‌ করে হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। স্তম্ভিত হয়ে ষ্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরে ভিতরে টের পায়, অদ্ভুদ একটা শিহরণ, কি নিদারুণ একটা কোমল অনুভূতি! সে এক অভিনব অনুভূতি। বড়ই তৃপ্তিদায়ক। যা পূর্বে কখনোই এমন উপলব্ধি করেনি।

যা ব্যাখ্যারও অতীত! অথচ কিছুক্ষণ আগেও মন মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়েছিল যোগেশ্বরের। কত অকথা-কুকথায় সমানে বকছিল।

কিন্তু এ আর নতুন কি! প্রত্যেক বছর শারদীয় উৎসবে দেবী দুর্গার আগমনের প্রারম্ভকালে মাথাটা কেমন বিগড়ে যায়। হুঁশ-জ্ঞান থাকেনা। একাকী নির্জন নিঃসঙ্গতায় পাগলের মতো হন্যে হয়ে কল্পনায় খুঁজে বেড়ায়, তার মৃতা স্ত্রী সাবিত্রীকে। কত নালিশ জানায়। তার সমস্যার কথা জানায়।
আজও সেই সকাল থেকে ভারাক্রান্ত মনে চা-জল খাবার নিয়ে বসেছিল। অথচ মুখে রুচী নেই। খাবারের প্রতি এতটুকু ভক্তি নেই। মুখেই ঢুকছিল না। কিন্তু যাদুমন্ত্রের মতো হঠাৎ মানসিক পরিবর্তনে অপ্রস্তুত যোগেশ্বর মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কি বলবে, কি করবে, দিশাই খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ থেমে আপনমনে বিড়বিড় করে ওঠে,-"পলি, আমার সে-ই ছোট্ট শিশুকন্যা! জন্মাবধি যার মুখই দর্শণ করি নাই!"

নামটা উচ্চারণের সাথে সাথেই অতীত বর্তমান সব এলোমেলো হয়ে গেল স্মৃতিকাতর যোগেশ্বরের। চকিতে হারিয়ে গেল, সেদিনের সেই মুহূর্তে, যেদিন প্রিয়তমা পত্নী সাবিত্রীর মহাপ্রয়াণে দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ভুলে গিয়েছিল, নিজের অস্তিত্ব। ভুলে গিয়েছিল, নৈতিকতা, মানবিকতা, জীবনের মুল্যবোধ। যার অভাবে পিতৃস্নেহ থেকে যাকে এতকাল ভ্রূঞ্চিত করেছিল, আজ তারই কোমল কণ্ঠস্বরে ছুঁয়ে গেল পিতৃত্বের শূন্য হৃদয়। কানায় কানায় ভরে গেল, আদর-স্নেহ-ভালোবাসায়। এ যেন এক বর্ণনাতীত অভিনব অনুভূতি! অনুভত হয়, পিতৃস্নেহ-মমতা-ভালোবাসার শিথিল বাঁধন কে যেন জোরে টেনে ধরেছে! সে এক অদৃশ্য বন্ধন শক্তি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতাপবোধে বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল যোগেশ্বর। বারবার অপরাধবোধের তীব্র দংশণে সংকোচ আর সংশয়ে বিচলিত হয়ে ওঠে। টের পায়, এক ধরণের বেদনানুভূতির তীব্র দংশণ। যা নদীর ঢেউ এর মতো বারবার ফিরে এসে মস্তিস্কের স্নায়ুকোষে আঘাত করতে লাগল। কি কঠিন, অসহনীয় সেই মুহূর্ত! অথচ এমন গহীন অনুভূতি দিয়ে কখনো অনুভব করেনি! সে এক অদ্ভুদ বৈপরীত্য যোগেশ্বরের!

হঠাৎ প্রগাঢ় আবেগে আপুত হয়ে মন-প্রাণ সারাশরীর যেন ক্রমশ সম্পৃক্ত হতে থাকে, মোহহীন সংসারের প্রতি, তার নিগৃহীত ও প্রবঞ্চিত আপন সন্তানের প্রতি। সম্পৃক্ত হতে থাকে, একজন পিতার আদর-স্নেহ-ভালোবাসার অদৃশ্য বন্ধনে। ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে ধরা দিতে। পিতৃত্বের আর অভিভাবকের দাবি নিয়ে পিতার পরিচয় দিতে। যে মিথ্যে সংস্কারের দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে সন্তানের কলঙ্ক রচনা করেছিল, তার হৃদয় থেকে সন্ত ানকে বর্জন করেছিল, আজ তারই কোমল সুমিষ্টি কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হোক, পিতা শব্দের চিরন্তন সত্য ও পবিত্র ধ্বনী। ঘুঁচে যাক, যোগেশ্বরের কু-সংস্কার। মুছে যাক তার অন্তরের পূঞ্জীভূত সকল গানি। তাই বুঝি ক্ষণপূর্বের কিশোরী কন্যা পামেলার মায়াজড়িত শিশুসুলভ শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর প্রতিঃধ্বনীত হয়ে বারবার কানে বাজতে লাগল যোগেশ্বরের।

এ কেমন বিধাতার লীলাখেলা! ভাগ্যের পরিক্রমায় বাস্তব সত্যতার সংঘাতে যোগেশ্বর আজ নিজেই নিজের কাছে পরাস্ত , অপদস্থ, অনুতপ্ত ও মর্মাহত। ক্ষণিকের মৌনতায় এবং বিমূঢ়তায় আজ নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

একেই বলে রক্তের টান। শরীরের অংশ, আত্মার সম্পর্ক। যাকে কখনো অস্বীকার করা যায়না। আর যায়না বলেই যোশ্বেরের মতো একজন হতভাগ্য পিতার আদর-স্নেহ-ভালোবাসার কোমল অনুভূতির তীব্র জাগরণে হঠাৎ মহাপ্রলয় ঘটে গেল তার হৃদয় পটভূমিতে। অস্থিতিশীলতায় তোলপাড় করে দিলো একজন অসহায় পিতার পিতৃত্বের হৃদয়কে। আর তৎক্ষণাৎ চাপা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলে ওঠে যোগেশ্বর,-"পলি, তার সেই পরিতক্তা কন্যা! জন্মাবধি আদৌ যার মুখদর্শণ করি নাই, চোখে দেখি নাই!"

শাস্ত্রে আছে, "পিতা পরমেশ্বর! পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম!" -হে প্রভু, এ আমি কি করছি! কেন এমন হলো! সন্তানের পিতা আমি, এ যে বড়ই অর্ধম, অপরাধ করছি আমি! আমার অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু! আমায় ক্ষমা করো!"

সংস্কার বিশ্বাসী যোগেশ্বর আজ বিবেকের তীব্র দংশণে মুর্ছাণ্বিত, বাক্যাহত। অনুতাপ আর অনুশোচনার আগুনে তার পাষাণহৃদয় বিগলিত হয়ে স্নেহাস্পদে সঞ্চালিত হতে লাগল মন-প্রাণ সারাশরীর! অনুভব করে, হৃদয় স্পর্শ করা এক অভিনব স্নেহানুভূতি! আর তা মরমে মরমে উপলব্ধি করেই হঠাৎ মন উদাস করা নীরব নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে অভাবনীয় ভাবনার উৎপত্তি হয় মস্তিস্কের মধ্যে। প্রশ্ন করে নিজেকে, স্ত্রী হারানোর শোকে বিহ্বলে ফুলের মতো একটা নিস্পাপ

শিশুকে তার পিতার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে, পিতার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার নিঃসঙ্গ জীবনে কি পেয়েছে সে? একদন্ড শান্তি পেয়েছে কোনদিন? কখনো কি সুখনিদ্রায় জীবনযাপন করতে পেরেছে কোনদিন?

অথচ ক্রোধের বশে দীর্ঘদিন যাবৎ অহেতুক অন্তর্কলহে শরীর অর্ধেক হয়ে গিয়েছে যোগেশ্বরের। বয়সের তুলনায় চিন্ত শক্তি ও প্রাণশক্তি অনেক কমে গিয়েছে। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে নির্বল নিস্তেজ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে ক্ষিদে-তৃষ্ণাও মালুম হয়না। পা টান টান করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। প্রায়শই উপবাসে অনিদ্রায় রজনী কাটায়। কখনো ঘুমের ঘোরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়ফড় করে ওঠে। কখনো জন শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে ওঠে বুক। মনে মনে প্রচন্ড কষ্ট পায় যোগেশ্বর। আর বুকের কষ্ট-বেদনাগুলি তরল হয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে দু'চোখের কোণায়। কিন্তু এতবড় একটা সত্যকে কেমন করে উন্মোচন করবে! কি কৈফেয়ৎ দেবে সে!
ভাবতে ভাবতে ক্ষণপূর্বের সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অসহ্য বেদনানুভূতির তীব্র দংশণে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে যোগেশ্বর। মনঃস্তাপে হঠাৎ পুঞ্জীভূত দ্বিধা আর দ্বন্ধের কালো ছায়া সড়ে গিয়ে তার হৃদয়গহ্বরে জাগ্রত হয়, পিতৃত্বের তীব্র অনুভূতি। রক্তের স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে, শিরা-উপশিরায়। এক দন্ডও স্বস্তি তে নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনা। কক্ষ্যচ্যুত উল্কার মতো তক্ষুণি উর্ধ্বঃশ্বাসে মরিয়া হয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

রিসিভারটা তখনও হাতে ধরা রেখেছিল পামেলার। গলা ফাটিয়ে বার ক'য়েক হ্যালো বলল। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে রিসিভারটা ধপ্ করে রেখে দিলো। বিব্রোত হয়ে বলল,-"রাবিশ, ননসেন্স! দিলো সক্কাল বেলায় মুডটা অফ্ করে, ষ্টুপিড!"

শুনতে পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয় রমলা। রান্নাঘর থেকে ডাক দিয়ে বলল,-"কি রে পলি, এসব কথা তুই কাকে বলছিস?"

গলার স্বর বিকৃতি করে পামেলা বলল,-"কে আবার, তোমার ঐ যোগেশ্বর না ঈশ্বর নামধারী লোকটা! কথাবাত্রা শুনেতো মনে হলো, তোমার বাল্যবন্ধু! অথচ আমার নাম বলতেই ব্যস, লেগে গেল মুখে তালা!" অট্টহাস্যে ব্যঙ্গ করে বলল,-"হেঃ, লোকটা গাঁজা ফাজা খেয়েছিল বোধহয়!"

চোখমুখ রাঙিয়ে রান্নাঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে রমলা। চটে গিয়ে ফোঁস করে ওঠে। অসন্তোষ হয়ে বলল,-"ছিঃ পলি, উনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষ! তোমার পিতৃসমতুল্য, গুরুজন! অমন অকথ্য ভাষায় মন্তব্য করে তাকে অসম্মান কোরো না! শত হলেও...!" কথাটা বলতে গিয়ে জিহ্বা কেটে থেমে গেল। পামেলার চোখে চোখ পড়তেই বলে, -"তা তোমার কথা হলো ওঁর সঙ্গে?"

লম্বা একটা হাই তুলে পামেলা বলল,-"তা'হলে আর বলছি কেন! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা তো এখনো তুমি দিলে না মা!"

গম্ভীর হয়ে রমলা বলল,-"এতো ভাবনার কি আছে! সবই তাঁর ইচ্ছে! তিনি চাইলে একদিন তুমি নিজেই সব জানতে পারবে! এনিয়ে অযথা আমায় বিব্রোত করোনা! কি পাপ যে করেছিলাম, কপালে যে আরো কত কি লেখা আছে, ভগবানই জানে!"

ইতিপূর্বে মুখ ভার করে ঘরে ঢুকে পড়ল পামেলা। পা টান টান করে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। রমলা বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে গেল রান্নাঘরে।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে, পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। চারিদিকে পুজো পুজো রব। মন্ডবে মন্ডবে ঢাক বাজজে, ঢোল বাজজে, চন্ডীপাঠ হচ্ছে। দুর থেকে ক্ষীণ শব্দে রেকর্ডে অতুলপ্রসাদী গান বাজজে, শোনা যাচ্ছে। পাড়ার শিশু-কিশোর-কিশোরী, নবিন-প্রবীন সকলেই খুশীর পাল তুলে মেতে উঠেছে শারোদৎসবের আনন্দ মেলায়। পামেলা তখনও নিজের সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের পরিচর্যা নিয়ে খুব ব্যস্ত! হঠাৎ গাড়ির শব্দে চমকে ওঠে। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত এক অচেনা অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক উদ্ভ্রান্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। দৌড়ে মাকে গিয়ে বলল, -"দ্যাখো তো মা, কে যেন আসছে আমাদের বাড়িতে!"

বুঝতে দেরী হলো না রমলার। কে আর আসবে! আসার মতো ওর আছেইবা কে সংসারে! কিন্তু শোনা মাত্রই বুকটা চমকে উঠল ওর। মুখখানাও বিবর্ন হয়ে গেল। মনে মনে বলল,-"আজ এতকাল পর যোগুদা আসছে? কিন্তু কেন? কিসের জন্য? কি চায় সে? এতগুলি বছর পার হয়ে গেল, মেয়ের খোঁজখবর নিয়েছিল কোনদিন? বেঁচে আছে, না মরে গিয়েছে, সেখবরও কি নিয়েছিল কোনদিন? দর্শণও তো দেয়নি কখনো! এখনো কি ওর বুকের জ্বালা মেটেনি? সে কেমন মানুষ! নিজের সন্তানের প্রতি এতটুকু মায়া-মমতাও কি নেই ওর অন্তরে? মেয়েটাকেও কি শান্তি দেবেনা কোনদিন! কিন্তু আজ কোন্ পরিচয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াবে! কি পরিচয় দেবে সে? পারবে, নিজের অপরাধ স্বীকার করে পলিকে গ্রহণ করতে? পিতার পরিচয় দিতে? সে কথা একবারও ভেবে দেখেছে? কিন্তু আজ তো কিছুই আর গোপন থাকবে না! নির্ঘাৎ চিৎকার চেঁচামিচি করে তুলকালামকান্ড একটা বাঁধিয়ে বসবে! পাড়ার লোক জড়ো করবে! তামাশা দেখাবে! কিন্তু পলি, আজ ওকে সামালাবে কে? কি কৈফেয়ৎ দেবে সে?

ইতিপূর্বে কলিং-বেলের রিংটা ঝিন্‌ঝিন্ করে বেজে উঠতেই বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল রমলার। আসন্ন বিরূপ পরিস্থিতির অনুমানিক চিত্র কল্পনা করেই বিষাদে ভরে গেল মন-মানসিকতা। অগত্যা শিথিল ভঙ্গিতে দরজাটা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল যোগেশ্বর। বড়বড় চোখ মেলে বিস্মিত দৃটিতে চেয়ে থাকে পামেলার মুখের দিকে!-এ কি, এ যে অবিকল সাবিত্রী! যেন ওরই পুণর্জনম ঘটেছে! সেই নাক, সেই চোখ, সেই জোড়া ভ্রু। মায়ের মতো সেই ডাগর চোখের মায়াবী চাহনি। পিষ্ঠদেশ জুড়ে সেই ঘন কালো লম্বা কোঁকড়ানো চুল! এ-ই আমার সেই কন্যা? আমারই রক্তের দিয়ে গড়া আমার সেই সন্তান? আমার আত্মার অংশ?

আর ভাবতে পারছে না যোগেশ্বর। সারাদুপুর ভবঘুরের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে সময় অতিবাহিত করেছে। একরাশ দ্বিধা আর আশঙ্কা নিয়ে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এখন সে বড় ক্লান্ত। একটু শান্তি পেতে চায়। অথচ এই মুহূর্তে ক্লান্তি আর অবসন্নতার এতটুকু রেশ কোথাও নেই তার শরীরে। খুঁজে পায় প্রবল প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। নতুন করে জাগ্রত হয়, বেঁচে থাকার সাধ। কি নিদারুণ সেই অনুভূতি! সে এক নতুন বিস্ময়! মুহূর্তে আনন্দাশ্রুর পাবনে পাবিত হয়ে ভরে গেল শুস্ক মরুভূমির মতো যোগেশ্বরের হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর। অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে অশ্রুসজলে চোখদু'টো লাল হয়ে ওঠে। অথচ অপরাধীর মতো ক্ষমা প্রার্থী হয়ে চেয়ে থাকে করুণ দৃষ্টিতে। কি অসহায় তার চাহনি। থর্‌থর্ করে হাত কাঁপে। ঠোঁট কাঁপে। ভারি হয়ে আসে গলার স্বর।

অবলীলায় দু'হাত প্রসারিত করে দিয়ে বলল,-"আয় মা আয়! আমার বুকে আয়! আজ তোরে দুচোখ ভরে দেখি! কতকাল দেখি নাই! আ-হা, বুকটা জুড়ে গেল আমার! এরেই কয় সংযোগ, সেই একই চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিতা, এলোকেশী, ঠিক এই বেশে পঞ্চমী তিথীতে প্রথম দেখেছিলাম আমার সাবিত্রীরে! তুই তো আমার **অন্নপুর্ণা মা! আনন্দময়ী মা!** আমায় চিনতে পেরেছিস মা!"

ফোঁস করে লম্বা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,-"ওরে, ওরে আমিই তড় হতভাগ্য পিতা, যোগেশ্বর! হ্যাঁ, আমিই যোগেশ্বর, তড় পিতা! আজ আমি বড় একা মা! বড় নিঃসঙ্গ! বুকটা আমার বহুকাল যাবৎ শূন্য হয়ে আছে মা! বাবা বলে একটিবার আমায় ডাক মা! মন যে আমার বড় উতলা হয়ে আছে শোনবার জন্য! বড় আশা নিয়ে এসেছি, এই বুড়ো ছেলেটাকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিসনে মা! আয় মা আয়, আমার বুকে আয়!" বলতে বলতে দেওয়ালে মাথা ঠুকে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে যোগেশ্বর।

অপ্রস্তুত পামেলা মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। যেন আকাশ থেকে পড়ল শুনে! নিজের কানদু'টোকে ওর কিছুতেই বিশ্বাস হয়না! ওকি জেগে জেগে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল নাকি! এ তো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কোনদিন! অথচ চন্দ্র সুর্য্যের মতো নিতান্তই বাস্তব সত্য! যাকে মৃত বলে জানতো, আজ সেই ব্যক্তিই সশরীরে ওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। প্রচন্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করে ওর মধ্যে। হাজার প্রশ্নের ভীড়ে ওকে বিচলিত করে তোলে। পুঞ্জীভূত অভিমান, ক্ষোভ আর বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে মায়ের মুখপানে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে। কিন্তু কি বলবে রমলা! অপ্রত্যাশিত যোগেশ্বরের আগমন ও অভাবনীয় ভাবমূর্তি লক্ষ্য করে বিস্ময়ে থ্ হয়ে গিয়েছিল।

কখনো যা কল্পনাই করেনি। চোখেমুখে নালিশ কিংবা অভিমানের ছাপ বিন্দুমাত্র কোথাও নেই যোগেশ্বরের। দীর্ঘদিন পর বুকের পাথর সড়ে গিয়ে মুখখানা কি শান্ত আর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওর! অথচ একটা শব্দও আর উচ্চারিত হয়না কারো। ভিতরে ভিতরে খুশীর পাবনে পাবিত করে হৃদয়ের দুকূল ছেয়ে গেলেও অভিমান আর অব্যক্ত খুশীর সংমিশ্রণে

চোখদু'টো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল রমলার। কিন্তু ওর ঐ নীরব নির্বিকার আচরণে সত্য প্রমাণিত হতেই মনকে প্রচন্ড আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করলো পামেলার। একরাশ মনবেদনা, অভিমান আর নালিশ নিয়ে চোখেমুখের বিচিত্র অবয়বে বিড়বিড় করে সমানে কিসব বলতে থাকে! কিন্তু ওর কোনো কথা কানে তোলে না রমলা। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে মায়ের হাতদু'টো সজোরে চেপে ধরে বলে,–'তবে তোমার এই বেশ কেন মা? তুমি কেন বৈধব্যের রীতি–নীতিগুলি সব যথাযথ পালন করো? একাদশী করো, নিরামিশ আহার ভোজন করো! কেন, কেন করো এসব? কেন একথা এতদিন আমায় বলোনি? জানাও নি! বলো মা বলো, কেন বলোনি? তোমাকে আজ বলতেই হবে, বলো কেন তোমার এই বেশ?'

পামেলার সন্নিকটে ধীর পায়ে এগিয়ে আসে যোগেশ্বর। মৃদুস্পর্শে ওর মাথায় হাতটা বুলিয়ে বলল,–"ওকথা বলে ওকে আর কষ্ট দিসনে মা! ওতো আমার ছোটবোন রমা, তোর পিসি! বেচারীর কপাল দোষে অকাল বৈধব্যেই জীবনের সব রং মুছে গিয়েছে ওর! তোর মা তো বহুদিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে! কোলে পিঠে করে তোকে রমাই লালন–পালন করেছে, বড় করেছে! তুই ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল!"
ক্রোধ আর অভিমানের সমন্বয়ে দুঃখে ফেটে পড়ে পামেলা। চোখমুখ লাল করে বলে,–"তবে কেন এতদিন আমায় দেখতে আসোনি? কোন্‌ অপরাধে? আমি কি করেছিলাম? কেন আমায় এতবড় শাস্তি দিয়েছ? এতদিন কেন পিতার সংস্পর্শ থেকে আমায় বঞ্চিত করে রেখেছিলে? কিসের জন্য? একথা কেন তোমরা আমায় এতদিন জানাও নি?"
বলতে বলতে যোগেশ্বরের মুখপানে চোখ তুলে একপলক চেয়েই দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বিকট শব্দে বন্ধ করে দিলো পামেলা।
রমলা বলল,–'দিলে তো মেয়েটার আনন্দ মাটি করে! শীগগির্‌ যাও দাদা, এবার সামলাও তোমার মেয়েকে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com

# বৈশাখী ছড়াঞ্জন

## বর্ষবরণ ১৪১৭বাঙলা

চৌদ্দ'শ সতেরো
তুমি বর্ণিল হও আরো।
তুমি এসো
পিড়ি পেতে বসো।

এসো তুমি হাল দুখীদের
ছন্দ নিয়ে,
তুমি এসো চৈতী ফুলের
গন্ধ নিয়ে।

তুমি এসো তালপাতার অই বাঁশির সুরে
ঘণকালো মেঘের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে।
তুমি এসো পান্তা-মরিচ
ইলিশভাজা হয়ে,
এই প্রবাসে তুমি এসো তিলের খাজা হয়ে।

## বর্ষবরণ ১৪০৮ বাঙলা

(১৪০৮ বাঙলায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ঝরে যাওয়া তর-তাজা প্রাণগুলোর স্মরণে)

বোম ফাটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মূলে যাদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?
আমরা জানি কারা

কর্তা নাকি কর্ম করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন

বাঙলা ও বাঙালিদের
ঘৃণা করে যারা।

বাংলা বর্ষ শুরুর মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ!

ওরে আমার পাগলা বাউল
কাল্‌বোশেখীর ঝড়,
সপ্ত আকাশ নিয়ে তাদের

উপর ভেঙ্গে পড় !!

## পরিচয়

আমার দাদা বীর ডুবুরী
বাবায় বাঘের টাগ,
দাদার দাদায় বন্ধু বানায়
বাঘের সঙ্গে ছাগ!
খালু ফুফা 'কীট্স ও শেলী'
খালায় নভোচারী,
ইচ্ছে হলেই দিতে পারি
সপ্ত আকাশ পাড়ি।

এই হাস্‌লি কেনো? ফাজিল তোরা
বোকা ব্যাঙের ছানা,
আমার দাদার চাকর ছিলো
তোদের বাবার নানা!
বৃদ্ধ কোলা বললো রেগে–
ওগো বীরের ঝি–
সব পরিচয় পেলাম তবে
তোর পরিচয় কী?